সহ-আয়োজক
pri Policy Research Institute

ডিজিটাল লেনদেনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের প্রসার ও চ্যালেঞ্জ

১৯ মে ২০২০ *প্রথম আলো* ও পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) আয়োজিত ‘ডিজিটাল লেনদেনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের প্রসার ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক ভার্চুয়াল গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আলোচকদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে এই ক্রোড়পত্রে ছাপা হলো।

ভার্চুয়াল গোলটেবিল বৈঠক
আয়োজনে : প্রথম আলো
pri Policy Research Institute
ডিজিটাল লেনদেনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের প্রসার ও চ্যালেঞ্জ

প্রথম আলো ও পিআরআই আয়োজিত ভার্চুয়াল গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা

আলোচনায় সুপারিশ

- সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি পরিবারের প্রাপক হিসেবে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।
- উপকারভোগীদের তালিকা গ্রামের মসজিদে বা প্রাইমারি স্কুলে টাঙিয়ে দিতে হবে, যাতে যাচাই-বাছাই করা যায়।
- পরিচয়পত্রবিহীন পরিবার শনাক্তকরণে অন্যান্য নথি (যেমন জন্মসনদ) ব্যবহার করে অস্থায়ীভাবে নিবন্ধন করা যেতে পারে।
- গোটা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আনা দরকার।
- যেহেতু বাজার এখনো কার্যকর, এই পরিস্থিতিতে নগদ সহায়তা সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি।
- মোবাইল বিলের ব্যবহার ও খরচ বিবেচনায় নিয়েও তালিকা নির্বাচন করা যেতে পারে।
- মাঠপর্যায়ের এনজিওরা একসঙ্গে হয়ে এমএফএসের কাজটা করা যেতে পারে।
- সামনে যে বাজেট আসছে, সেই বাজেটে কিন্তু মূল ফোকাসটা থাকা উচিত—সামাজিক সুরক্ষা খাত।

যাঁরা অংশ নিলেন

মোস্তাফা জব্বার
মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

আহসান এইচ মনসুর
নির্বাহী পরিচালক, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)।

আসিফ সালেহ
নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক।

তহুরুল হাসান
কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, ডিজিটাল অর্থনৈতিক সেবা, এটুআই।

আবুল কাশেম মো. শিরীন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

কামাল কাদির
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিকাশ।

খন্দকার সাখাওয়াত আলী
ইমেরিটাস ফেলো, উন্নয়ন সমন্বয়।

এম এ রাজ্জাক
গবেষণা পরিচালক, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)।

সূচনা বক্তব্য
আব্দুল কাইয়ুম
সহযোগী সম্পাদক, প্রথম আলো।

সঞ্চালক
ফিরোজ চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক, প্রথম আলো।

আলোচনা

আব্দুল কাইয়ুম

কোভিড-১৯-এর কারণে আজকের এই গোলটেবিল বৈঠকটি ঘরে বসেই আমরা করছি। আমাদের মেসেজগুলো আমরা পৌঁছে দেব সবার কাছে। জিটুপি—সরকার থেকে ব্যক্তি, মানে সরকার যাদের কাছে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতাগুলো পৌঁছে দিতে চায়, মোবাইলের মাধ্যমে হোক বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই হোক, সেখানে কিন্তু ডিজিটাল পদ্ধতিটা এখন বেশি করে গুরুত্ব পাচ্ছে। সেখানে সমস্যাগুলো কী আছে, নতুন আরও কী কী উদ্যোগ আমরা নিতে পারি, এই বিষয়গুলোই আজকের আলোচনায় আসবে।

সবার কাছে যদি মোবাইল ফোন না থাকে, ১০ টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে পারে, যার কাছে আমরা টাকাটা পৌঁছাতে চাই, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা দুস্থ জনগণ বা কোনো দুর্যোগে আক্রান্ত এমন জনগণের কাছে সরাসরি যেন পৌঁছে যায়।

ফিরোজ চৌধুরী

সূচনা বক্তব্যের পর এবার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি ড. এম এ রাজ্জাককে।

এম এ রাজ্জাক

> সামাজিক নিরাপত্তাখাতের বাজেট যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হবে এবং তা অবশ্যই পেনশন বরাদ্দ ছাড়াই।

কোভিড-১৯ মহামারি আসার পর সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশনের অভাব প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে। এই অভাবকে একটি সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে পুরো সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থাকে এখন ঢেলে সাজানো যায়।

দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম, যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য, দুস্থ ভাতা, ইত্যাদি ধীরে ধীরে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী হিসেবে বিকাশমান হয়েছে। কিন্তু এগুলো ছিল বেশির ভাগই অ্যাডহক ভিত্তিতে। কোনো সুসংগত ও সুগঠিত কৌশলগত কাঠামো ছিল না। একটি সময়োচিত উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করে। সামগ্রিক পদ্ধতির কার্যকারিতা অর্জনের জন্য এটি সরকার থেকে ব্যক্তি (জিটুপি) ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিছু অগ্রগতি হয়েছে, যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তিগুলো এখন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে উপকারভোগীদের নির্বাচন, তথ্যভান্ডার বা ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) গড়ে তোলা, অত্যন্ত স্বল্প সাহায্য, এবং সম্ভাব্য সব উপকারভোগীকে নিরাপত্তা জালের আওতায় আনতে না পারা।

এ ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থায় শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রসার খুবই সীমিত। শহরের জনবসতির প্রকৃতি বিবেচনা করে শহরের গরিব এবং অনগ্রসর পরিবারগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্তিকরণ করা সহজ নয়।

কোভিড-১৯-এর আঘাত আসার আগেই দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি। ১২০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বাজেট রয়েছে ৭০ হাজার কোটি টাকা, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় আড়াই শতাংশ। এই বাজেটের ৩৫ শতাংশেই বরাদ্দ রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশনভাতার জন্য।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা জরিপের তথ্য ব্যবহার করে দেখা গেছে, ৭১ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তি নিরাপত্তাবেষ্টনীর বাইরে রয়েছেন। যাঁরা বেষ্টনীর মধ্যে আছেন, তাঁদের ৪৭ শতাংশেরই সাহায্য পাওয়া উচিত নয়।

কোভিড-১৯-এর বর্তমান সংকটে নগদ অর্থসহায়তা একটি উপযুক্ত ও কার্যকর পদ্ধতি। যেহেতু বাজার এখনো কার্যকর, এই পরিস্থিতিতে নগদ সহায়তা সবচেয়ে উপযুক্ত। দুর্নীতি কর্মকাণ্ডের বিপরীতে নগদ অর্থ সরাসরি ডিজিটাল ব্যবস্থায় পাঠানো সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।

কোভিডের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ৪ কোটি থেকে বেড়ে সাত কোটি পর্যন্ত হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। সুতরাং আমাদের পরামর্শ হলো চলমান সংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অতিরিক্ত দেড় কোটি পরিবারকে সরাসরি নগদ অর্থ সহায়তা প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। তিন মাসের জন্য অতিরিক্ত দেড় কোটি পরিবারকে সরাসরি মাসে ৩ হাজার করে টাকা দিলে ব্যয় হবে সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকার মতো এবং এই ব্যয়টা যৌক্তিক হবে।

সুবিধাভোগী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পরিবারগুলোকে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) সহায়তায় স্ব-নিবন্ধন করতে বলা যেতে পারে। পরিচয়পত্রবিহীন পরিবারগুলো শনাক্তকরণে অন্যান্য নথি (যেমন জন্মসনদ) ব্যবহার করে অস্থায়ীভাবে নিবন্ধনভুক্ত হতে পারে। সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি পরিবারের প্রাপক হিসেবে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। বিভিন্ন গবেষণায় অনেক প্রমাণ আছে যে নারীরা আয়ের বা সম্পদের ব্যবহারের কর্তৃত্ব পেলে সেটার সদ্ব্যবহার হয়, যেখান থেকে পরিবারের মধ্যে শিশু এবং বয়স্ক সদস্যদের অধিকতর কল্যাণের সুযোগ থাকে। এখানে উল্লেখ করা যায়, ২০১১ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবধানটি ১১ থেকে ২৯ শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে। নারীদের মুঠোফোনের মালিকানার সীমিত সম্প্রসারণ এটির একটি অন্যতম অন্তরায়।

পরিশেষে, প্রস্তাবিত নগদ সহায়তা কার্যক্রমটিকে ইতিমধ্যে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সঙ্গে পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। নতুন কয়েকটি উদ্যোগ (যেমন ৫০ লোখ পরিবারকে সরকারের সহায়তা) বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার পরিপূরক হতে পারে। তবে দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়ার কারণে এর বিস্তৃতি বাড়ানো জরুরি। সামাজিক নিরাপত্তাখাতের বাজেট যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হবে এবং তা অবশ্যই পেনশন বরাদ্দ ছাড়াই। কোভিড-১৯ সংকটের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দরকার।

আহসান এইচ মনসুর

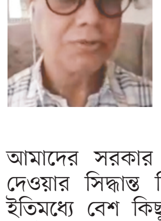

> সরকারের তালিকাতেও কিছু ভুলভ্রান্তি লক্ষ করা যাচ্ছে, এই তালিকাকে মাঠপর্যায়ে ভেরিফিকেশন করা দরকার।

আমাদের সরকার ৫০ লাখ পরিবারকে টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে বেশ কিছু কাজ করে ফেলেছে।। এই অর্থটা দেওয়ার সময় আমরা টের পাচ্ছি, কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? একই মোবাইল নম্বরের বিপরীতে বিপুলসংখ্যক নাম দেওয়া হয়েছে। আবার দেখা যাচ্ছে ব্যক্তির সঙ্গে এনআইডির নাম মিলছে না, সেখানে একটা অসামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে। এর সমাধান করতে হবে।

এই সমস্যা থেকে উত্তরণের একটা উপায় হতে পারে যে, যাদের সাহায্য দরকার তারা নিজেরাই স্ব-নিবন্ধন করে সরকারের কাছে একটি নির্দিষ্ট নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে দিবে। সেই সঙ্গে তার নাম ও এনআইডি নম্বর সহ পরিবার সদস্যদের নাম ও এনআইডি নম্বরও যুক্ত করে দিতে হবে। এরপর সরকার যাচাই করে দেখে তালিকায় তাদের নাম যুক্ত করে টাকা দিতে পারে।

সরকারের তালিকাতেও কিছু ভুলভ্রান্তি লক্ষ করা যাচ্ছে। এই তালিকাকে মাঠপর্যায়ে ভেরিফিকেশন করা দরকার। যেমন আমার নিজ গ্রামের অভিজ্ঞতা বলি, তালিকায় থাকা ৪২০ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন গ্রামের হলেও বাকি ৪১৬ জনই গ্রামের বাইরের ভুয়া বা অস্তিত্ববিহীন হিসেবে এসেছে। তদন্তে এটা ধরা পড়েছে। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে তো এটি কার্যকর হবে না। আশা করি, বিজ্ঞ আলোচকেরা এ থেকে উত্তরণের সঠিক পথ আমাদের দেখিয়ে দেবেন।

মোস্তাফা জব্বার

> পুরো সামাজিক নিরাপত্তা খাতই ডিজিটাল হওয়া উচিত। এটা এখন অনিবার্য প্রক্রিয়া।

মূল প্রবন্ধে সব প্রেক্ষিতই আসলে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ। করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ বাস্তবতায় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। কোভিড এসে কতগুলো জায়গায় আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল।

চলমান কোভিড পরিস্থিতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মহীনতা ইত্যাদির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর সব প্রান্তেই এ ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

২০১৫ সালের সামাজিক নিরাপত্তার যে দলিলটির কথা বলা হয়েছে, তাতে বোঝা গেছে যে কৌশলপত্রটি একটি ভালো দলিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ দলিলটি আমরা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারি কি না, বাস্তবায়ন করতে পারি কি না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ উদ্যোগ, ৫০ লাখ পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া, আড়াই হাজার টাকা করে, এটি আলোচনায় এসেছে। আমরা যে প্রক্রিয়ার মধ্যে এই সামাজিক নিরাপত্তার সেবাটা দিচ্ছি, সেটা ডিজিটাল পদ্ধতিতে। এখন তো মনে হচ্ছে পুরো সামাজিক নিরাপত্তা খাতই ডিজিটাল হওয়া উচিত। এটা এখন অনিবার্য প্রক্রিয়া।

যখন আমরা প্রণোদনাগুলো দিতে যাচ্ছি, তখন সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য ডেটাবেইস যাচাই করার প্রয়োজন হয়েছে। কোভিড আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের ডেটার অভাব আছে, আমাদের যে তথ্যের প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য আমরা পাচ্ছি না। কেবল তালিকায় গোলমাল নয়, যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে আমরা যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কাজ করছি, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে ভুয়া নম্বর ছাড়াও জাতীয় পরিচয়পত্র-সংক্রান্ত (এনআইডি) ভুল আছে এবং অন্যান্য ভুল তো আছেই। এখানে একটি ভালো দিক আমি বলব, আমরা এই ডেটাবেইসটা করেছিলাম বলেই আজকে অন্তত ডিজিটাল ভেরিফিকেশন করার সুযোগটা তৈরি হয়েছে।

আমরা এর মধ্যে সিম রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে এনআইডি যেহেতু ভেরিফাই করেছি, এটা প্রমাণিত যে এই ডেটাবেইসটা আমরা যথাযথভাবে মেইনটেইন করি। ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) বলে আরেকটি প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি, সে প্রকল্পের আওতায় ফোনসেটের রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করা যাবে। এর মাধ্যমে, কে কোন সেটে কোন সিম ব্যবহার করছে, এটিও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

কোভিড-পরবর্তীকালে পৃথিবীটা কোভিডের আগের, কোভিডকালের কোনোটার মতোই থাকবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা কিংবা যা-ই দেখেন না কেন, সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে ডিজিটালাইজেশনের দিকে। পেশাগত পরিবর্তনটা অনিবার্য ।

আমার দিক থেকে শুধু এইটুকু বলব, আমরা ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা শুনেছিলাম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ থেকে, তারপর ২০০৯ সালে থেকে তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে এটা মনে হতে পারে, এই ১১ বছরে আমাদের যতটা অগ্রগতি সাধন করার কথা, ততটা করতে পারিনি। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আমরা একটা কৃষিভিত্তিক দেশ ছিলাম, আমরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে অংশগ্রহণই করতে পারিনি, সেখান থেকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে অংশ নেওয়ার চিত্র হতাশাব্যঞ্জক নয়। মাত্র ১১ বছরের প্রচেষ্টায় আমাদের ডিজিটালাইজেশনের যে রূপটা দেখছি, তা আশাব্যঞ্জক। এর গতিটা বোধ হয় কোভিড-১৯ এসে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।

এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করাই এখন মূল আমাদের অগ্রাধিকার। পুরো ব্যবস্থাটা যত ডিজিটাল হবে, যত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে, তত ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করা সম্ভব হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

কামাল কাদির

> যেভাবে প্রলুব্ধ করে তালিকা করা হয়েছিল, তা থেকে কেউ টাকা তুলে নিয়ে যেতে পারেনি।

সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা কারা পাবে, তাদের নির্বাচন করা নিয়ে কথা উঠেছে। মোবাইল বিলের ব্যবহার ও খরচ বিবেচনায় নিয়েও তালিকা নির্বাচন করা যেতে পারে। আমি একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বলতে চাচ্ছি : যেমন ধরুন আমার মা প্রতি মাসে ১০০ টাকার এয়ার টাইম কিনছেন এবং একবারেই তিনি ১০০ টাকার এয়ার টাইম কিনেছেন। আবার দেখা যাচ্ছে একজন রিকশাওয়ালাও মাসে ১০০ টাকা কিনেছে, কিন্তু তিনি কিনেছেন ৫-৬ বারে ১০ টাকা ১৫ টাকা করে। এই ক্রয়ক্ষমতা দেখেও মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা শনাক্ত করা যায়। এ জন্যই আমি বলতে চাই, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদেরা যদি একটা ইকোনমিক মডেল তৈরি করেন, এই ধরনের ছাঁকনি দিয়ে আমরা এদের বাছাই করতে পারি। এতে আমার মা বাদ পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই রিকশাওয়ালারা উঠে আসছে। এই ছাঁকনিগুলো ব্যবহার করে দারিদ্র্যসীমার মধ্যে কারা আছে, তা সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব।

বিভিন্ন মিডিয়ায় কদিন ধরে ভুল উপকারভোগী নির্বাচন করা বিষয়ে একটা প্রশ্ন আসছে। তবে ৫০ লাখ পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তাবিষয়ক তালিকার একটা স্বস্তির খবর দিতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর অফিস, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক যে প্যারামিটারগুলো সেট করে দিয়েছিল, প্রতারকেরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। যেভাবে প্রলুব্ধ করে তালিকা করা হয়েছিল, তা থেকে কেউ টাকা তুলে নিয়ে যেতে পারেনি। এ পর্যন্ত ৮ লাখ লোককে টাকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

দেশে মুঠোফোন ব্যবহার করছেন প্রায় ১২ কোটি মানুষ, আর এমএফএস ব্যবহার করছে সাত কোটির বেশি মানুষ। ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট পর্যাপ্ত আছে, এখন দরকার সঠিক উদ্যোগ।

সুতরাং আমি এইটুকু বলেই শেষ করব, আসলে কিন্তু অনেক এগোনো যেত, কিন্তু তারপরও যা আছে, সেটা দিয়ে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ রেজাল্ট অ্যাচিভ করা সম্ভব। হয়তো কিছু ভুল থেকে যাবে, কিন্তু সেই ভুলের পরিমাণ ৫-১০ শতাংশের বেশি হবে না, যদি ছাঁকনিগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

আবুল কাশেম মো. শিরীন

> শুধু মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) নয়, এর পাশাপাশি সব ধরনের ডিজিটাল চ্যানেলগুলোকে যেন সংযুক্ত করা হয়।

শুধু মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) নয়, ব্যাংক হিসাব ও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও বেতন-মজুরি দেওয়া হচ্ছে। সরকার পোশাক খাতে যে ৫ হাজার কোটি টাকা দিতে বলেছে ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে, তাতে অনেক হিসাব বেড়েছে। এই নীতিসহায়তার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। আবার ৫০ লাখ পরিবারকে এমএফএসের মাধ্যমে দেওয়ার কথা বলার কারণেই কিন্তু অনেক কিছু ধরা পড়েছে। যেটা আমরা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি, এটা মিনিস্ট্রি লেভেলেই ধরা পড়েছে, আমাদের লেভেলে এসে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ ধরা পড়েছে, যেটা পত্রিকায় আসেনি। সেখানে এসে দেখা গেছে, যে এনআইডি নম্বর দিয়েছে, সেই এনআইডির কোনো অস্তিত্বই নেই। সেটা বাতিল হয়ে গেছে। এনআইডির অস্তিত্ব থাকলেও সেটার জন্মতারিখ মিলছে না। কাজেই সেটাও বাতিল হয়ে গেছে। তারপর দেখা যাচ্ছে, নাম মিলছে না। এই রকম বিভিন্ন কারণে আমাদের হাতে কিন্তু প্রচুর বাতিলের ঘটনা ঘটেছে। হাতে হাতে টাকা দেওয়ার কথা বললে কিছুই ধরা পড়ত না। সরকার যদি চায়, গোটা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আনা সম্ভব।

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে প্রায় ৮০ লাখ অ্যাকাউন্ট আছে। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিন্তু এজেন্ট ব্যাংকিং চালু হয়ে গেছে, সেখানে সবগুলো ব্যাংক কিন্তু একত্রে কাজ করছে, সেই এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে ফিঙ্গার প্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে, এখানে কিন্তু মোবাইল ফোনের প্রয়োজন নেই। কাজেই একজন উপকারভোগীর যদি মোবাইল না থাকে তাহলে কিছুই আসে যায় না। ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে যখন নিচ্ছে টাকাটা, তখন আরও অথেন্টিক হচ্ছে। নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে, এই লোকই সেই লোক। সে যে ওই গ্রামের বাসিন্দা আমি নিশ্চিত, কারণ আমি তার এনআইডি চেক করেছি। অনলাইনে এটা চেক হয়েছে। সুতরাং আমি অনুরোধ করব, শুধু মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) নয়, এর পাশাপাশি সব ধরনের ডিজিটাল চ্যানেলগুলোকে যেন সংযুক্ত করা হয়। কারও যদি বায়োমেট্রিক অ্যাকাউন্ট থাকে, সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকে, তা-ও কাজে লাগানো যেতে পারে।

খন্দকার সাখাওয়াত আলী

> গ্রাহকের স্বার্থটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।... গ্রাহকের পছন্দের স্বাধীনতার বিষয়টি মনে রাখা জরুরি।

আমি নীতিসহায়তার প্রশ্নেই আলোচনাটা রাখব। ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল তৈরি হলো এবং সেই আলোকেই আমাদের সামাজিক সুরক্ষা খাতে যে অর্থগুলো বরাদ্দ হয়, সেটি যেন মানুষ পায়, সে জন্য এই নীতিকৌশলটা করা হয়। এর পেছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক, তার সঙ্গে পিপিআরসি ও ইউএনডিপি যুক্ত ছিল, আমি সেই স্টাডির সঙ্গে ছিলাম।

গভর্নেন্স ইস্যুতে আমি আমার কথাগুলো বলার চেষ্টা করব। সাবেক অর্থসচিব মুসলেম উদ্দিন অবসরে যাওয়ার আগে, ডিভাইসের মাধ্যমে ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে কীভাবে অর্থ দেওয়া যায়, সেটার একটা উদ্যোগ নেন। সেখানে বলেছিলেন, গ্রাহকের স্বার্থটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আমি প্রথম পয়েন্টটাই আনতে চাই, গ্রাহকের পছন্দের স্বাধীনতার বিষয়টি মনে রাখা জরুরি। তিনটি কারণে এটা জরুরি। প্রথমত হচ্ছে, এটি বাজারটাকে প্রতিযোগিতামূলক করবে। এমএফএসসহ অন্যরা যারা এই সেবা দিতে চায়, তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা তৈরিতে এটি সাহায্য করবে। সক্ষমতার ভিত্তিতেই সাধারণত গ্রাহক তার সেবাটা নিতে চায়। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোতে ক্যাশ ট্রান্সফারের জায়গায় মনোযোগ দিতে হবে।

তবে ব্যয় ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা যাচাইয়ের জন্য নজরদারির ব্যবস্থা থাকাও জরুরি। ৫০ লাখ পরিবারকে টাকা দেওয়ার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ভালো। যাদের কারণে এটি নষ্ট হবে, তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

আরেকটি বিষয়, সরকার ক্রয়নীতিমালা এখানে অনুসরণ করতে হবে, এখানে যেন হ্যান্ড পিক না হয়। কোনো একটি সুনির্দিষ্ট এমএফএস-কে আমরা একটি প্রকল্প দিচ্ছি, আরেকজনকে আরেকটি প্রকল্প দিচ্ছি, এটা না। এটা প্রতিযোগিতামূলক বাছাইয়ের মাধ্যমে যেন হয়। সক্ষমতার ভিত্তিতে যেন হয়। আমরা যেন একাধিককে দিই। সক্ষমতা নেই এমন কাউকে দিলে ঘটনাটি সরকারকেও বিব্রত করবে এবং যারা গ্রাহক তাদেরও ভোগান্তিতে ফেলবে।

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ইন্ডাস্ট্রি আসলে ৩টি ডিসিপ্লিনের সমাহার। ব্যাংকিং, অ্যাকাউন্টিং ও সোশিওলজি। কারণ, আমরা যে খাত নিয়ে কথা বলছি, সামাজিক সুরক্ষা খাত, দারিদ্র্যকে বোঝার জন্য, ইকোনমিক অ্যাপ্রোচটা যথেষ্ট নয়, সেখানে সোশিওলজিও বুঝতে হবে।

আমাদের যে সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয়গুলো হচ্ছে, সেটি যথাযথভাবে হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য সামাজিক পরিবীক্ষণটা জরুরি।

বর্তমান করোনাকালে আমরা দেখছি যে দারিদ্র্য বাড়ার আশঙ্কার সামনে আমরা আছি। তাই সামনে যে বাজেট আসছে, সেই বাজেটে কিন্তু মূল ফোকাসটা থাকা উচিত—সামাজিক সুরক্ষা খাত। সেই জায়গাতে সরাসরি উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানো জরুরি।

আসিফ সালেহ

> জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা মোবাইল হিসাব না থাকলেই সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি তা পাবেন না, এটা ঠিক নয়।

ডিজিটালাইজেশন যে খুব দ্রুতগতিতে হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের নিজেদের ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা থেকেই যদি বলি, ব্র্যাক ৩ লাখ পরিবারের কাছে সহায়তা পৌঁছে দিয়েছে, প্রথম ফেজটাই যখন গিয়েছে তখন আমরা ভেবেছি অনেকেরই হয়তো মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) থাকবে না, এবং ওই সময় লকডাউনের প্রথম ফেজে, এজেন্ট নেটওয়ার্ক বন্ধ ছিল বলে আমরা প্রায় ৮৫ শতাংশ অর্থ আমরা ক্যাশে দিয়েছি। দ্বিতীয় ফেজে গিয়ে যখন আমরা অ্যানালাইসিস করলাম, তখন দেখা গেল, হতদরিদ্র টার্গেট গ্রুপ, যারা আমাদের এই সাহায্য পাবে, তাদের ৩৪ শতাংশ মানুষের এমএফএস আছে অথবা অ্যাকসেস টু এজেন্ট আছে এবং তারপরে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এমন কেউ আছে নাকি তার আশেপাশে, যাকে সে বিশ্বাস করে, যার কাছে আমরা টাকাটা পাঠাতে পারি। তখনই নম্বরটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ৮৪ শতাংশ।

সরকারের সিদ্ধান্তের কারণে অনেক কিছু খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে, আরএমজি (গার্মেন্টস) সেক্টরে প্রণোদনা একটা ভালো উদাহরণ।

আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ইনিশিয়াল টার্গেটিংয়ের যে ব্যাপারটা, এটা এখনো একটা পলিটিক্যাল প্রসেস। এই পলিটিক্যাল প্রসেসের মধ্যে যদি স্বচ্ছতা না থাকে, তাহলে ঠিক মানুষের কাছে যাবে না। সে ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে যে প্রথমে তালিকাতেই চেক অ্যান্ড ব্যালান্স দরকার। আমরা ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের একটা উদ্যোগ শুরু করেছি, ৭টা ওয়ার্ডে এটা শুরু করেছি, ওয়ার্ড কমিশনার ও সিভিল সোসাইটির মাধ্যমে একটা তালিকা তৈরি হচ্ছে। এটা পরীক্ষামূলকভাবে, ঈদের পরপরই কাজ শুরু করব। বিটিআরসির একটা পারমিশন নিয়েছি, টেলকোর ডেটা ব্যবহার করে, তাদের ফোনের ইউজেস প্যাটার্ন দেখে তালিকা চূড়ান্ত করা।

প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনার যে ঘোষণাটা সম্প্রতি এসেছে, সেখানে আমরা দেখেছি যে তিন ধাপে যাচাই হচ্ছে, সেখানে জাতীয় পরিচয়পত্র থাকাটা অন্যতম দিক। এটা ঠিক যে ত্রুটিবিচ্যুতি ঠেকাতে তিন ধাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা মোবাইল হিসাব না থাকলেই সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি তা পাবেন না, এটা ঠিক নয়। তবে হিসাব খোলার কাজটিও পাশাপাশি শুরু হতে পারে। ফলে উপকারভোগী নির্বাচনটা যেমন দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে, তাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকটিও দেখতে হবে।

আমার মনে হয়, মাঠপর্যায়ের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, এনজিও আছে, তারা একসঙ্গে হয়ে এমএফএসের এই কাজটা করতে পারি।

তহুরুল হাসান

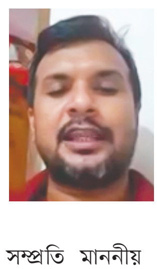

> সেবা দেওয়ার বিনিময়ে মাশুল বা চার্জের বিষয়ে আমাদের একটা মডেল দাঁড় করাতে হবে।

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত, মানবিক সহায়তা কর্মসূচি হিসেবে ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ এবং পোশাকশিল্প খাতের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা দেওয়ার উদ্যোগ যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটা বড় মাইলস্টোন। এই উদাহরণটা শুধু কোভিড-১৯-এর সময়ই না, সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগ যেসব সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে, তাদের জন্য আসলে একটা দিকনির্দেশনা। কারোরই আর ম্যানুয়াল বসে থাকার সুযোগ নেই, সবাইকে তাদের প্রোগ্রামগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিয়ে আসতে হবে।

তবে প্রযুক্তিগত অক্ষমতার কারণে কেউ যাতে বাদ না পড়ে, তা-ও দেখতে হাব। এ ব্যাপারে এনজিওগুলোকেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেবা দেওয়ার বিনিময়ে মাশুল বা চার্জের বিষয়ে এমএফএসগুলোর ওপর চাপানো হচ্ছে। বলার চেষ্টা করা হচ্ছে, তারা তো অনেক লাভ করছে, এই কষ্ট তারা বেয়ার করতেই পারে। কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, এটা সিএসআরের আওতায় দাঁড়াবে না। এর জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড পলিসি থাকতে হবে, আমি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডও দেখেছি। প্রতিটি দেশেই কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিজনেস মডেল ঠিক করে দেওয়া আছে, যখন সরকার বা কোনো বেসরকারি সংস্থা এসব ডিজিটাল চ্যানেলগুলো থেকে সার্ভিস নেবে, তখন সার্ভিস বা চার্জটা কী হবে, কীভাবে ভাগাভাগি হবে, চার্জ কী হবে, তা পূর্বনির্ধারিত। আমাদের এ বিষয়ে একটা মডেল দাঁড় করাতে হবে। নজরদারির ব্যবস্থাও থাকা চাই।

আহসান এইচ মনসুর

আগে যে সনাতন পদ্ধতি ছিল, যেখানে দুর্যোগের সময় খাদ্য বিতরণ করা হতো, সেটাতে অনেক ধাপ ছিল খাদ্য কিনতে হতো মন্ত্রণালয়কে, খাদ্যগুলো গুদামজাত করে রাখতে হতো, খাদ্যগুলো আবার ট্রাকে করে সংশ্লিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে হতো এবং তারপরে একটা তালিকার ভিত্তিতে গ্রামের লোকজনের মধ্যে বিতরণ করা হতো। এটাও আমরা জানি, প্রতিটা ধাপের সঙ্গে একধরনের দুর্নীতি, একধরনের সিস্টেম লস ইত্যাদি ব্যাপকভাবে জড়িত। শুধু আজকে নয়, এটা ব্রিটিশ আমল থেকেই চলে আসছে। আমাদের কালচারের মধ্যে চলে এসেছে। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা সরাসরি ক্যাশ ট্রান্সফারের মাধ্যমে, প্রথম যে তিনটা ধাপ, খাদ্য কেনা, খাদ্য মজুত ও খাদ্য পরিবহন—এই তিনটা ধাপকে আমরা অতিক্রম করতে পারি। কিন্তু শেষ ধাপটায় চ্যালেঞ্জটা রয়ে যাচ্ছে, কীভাবে উপকারভোগী ব্যক্তির কাছে পৌঁছাতে পারি।

পলিটিক্যাল ইকোনমির কথা ভুলে যাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত সরকার যেটাই করুক, তাদের মনে একটা পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল আছেই। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, কোনো অনিয়ম সহ্য করবেন না, বিশেষ করে ত্রাণ বিতরণের ব্যাপারে। আমরা চাই, রাজনৈতিক বিবেচনা যেন আমরা প্রাধান্য না দিয়ে দরিদ্রদের কাছে টাকা বা খাদ্য যেটাই হোক না কেন, সেটা যেন সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, সেটা যেন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি। রাজনীতিকরণকে প্রাধান্য দিলে হবে না।

আমাদের যেটা করা উচিত, যে তালিকাটা আমরা নিই, সেই তালিকাটা গ্রামে পৌঁছে দেওয়া। সেই গ্রামের একটা মসজিদে সেটা টাঙিয়ে দিতে পারি, গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে সেটা টাঙিয়ে দিতে পারি। আমি মনে করি একাধিক জায়গায় সেটা টাঙিয়ে দেওয়া দরকার। সবাইকে জানিয়ে দেওয়া, যে আপনারা দেখে নিন, আপনাদের গ্রামের যারা গরিব তাদের নাম এখানে কি না, সেই সঙ্গে যদি আমরা ফিডব্যাক নেওয়ারও ব্যবস্থা করতে পারি। শুধু টেকনিক্যাল সলিউশন দিয়ে কিন্তু আমরা সবগুলোকে সমাধান করতে পারব না। এটার একটা সোশিও ইকোনমিক প্রবলেম আছে, সেটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে। গ্রামকে ভুলে যাওয়া যাবে না।

সবশেষে আমি বলব, আমরা এখনো আমাদের যাত্রার শুরুর দিকে আছি, অনেক দূর যেতে হবে, অনেক কাজ সামনে আছে। সরকার, টেকনোলজি যাঁরা সাপোর্ট করেন তাঁরা, তাঁদের মতামত, তারপরে হচ্ছে জনগণ, এনজিও এবং মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন, সবাইকে নিয়ে যদি একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়, আমি মনে করি, বাংলাদেশ আরেকটা মডেল তৈরি করতে পারে বিশ্বের জন্য।

ফিরোজ চৌধুরী

কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে যে নতুন বাস্তবতা তৈরি হচ্ছে, আরও মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ছে, তাদের জন্য কী করা যেতে পারে, সম্মানিত আলোচকেরা তা তুলে ধরেছেন। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের অর্থ ডিজিটাল মাধ্যমে প্রদানের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

আমরা চাইব, সামাজিক নিরাপত্তা খাতের জন্য সরকারের যে বরাদ্দ, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার যে বরাদ্দ এবং নানা ধরনের যে কার্যক্রম আছে, সেগুলোর সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগণ বেশি মাত্রায় উপকারভোগী হবে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য, প্রতিটি জনগণ যেন এর সুবিধাভোগী হয়, সেই প্রত্যাশা রাখছি।

আজকের ‘ভার্চুয়াল গোলটেবিল’ বৈঠকে মাননীয় মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ও অন্যান্য সম্মানিত আলোচক যাঁরা যুক্ত হয়েছেন তাঁদের *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।